boidownload24.blogspot.com

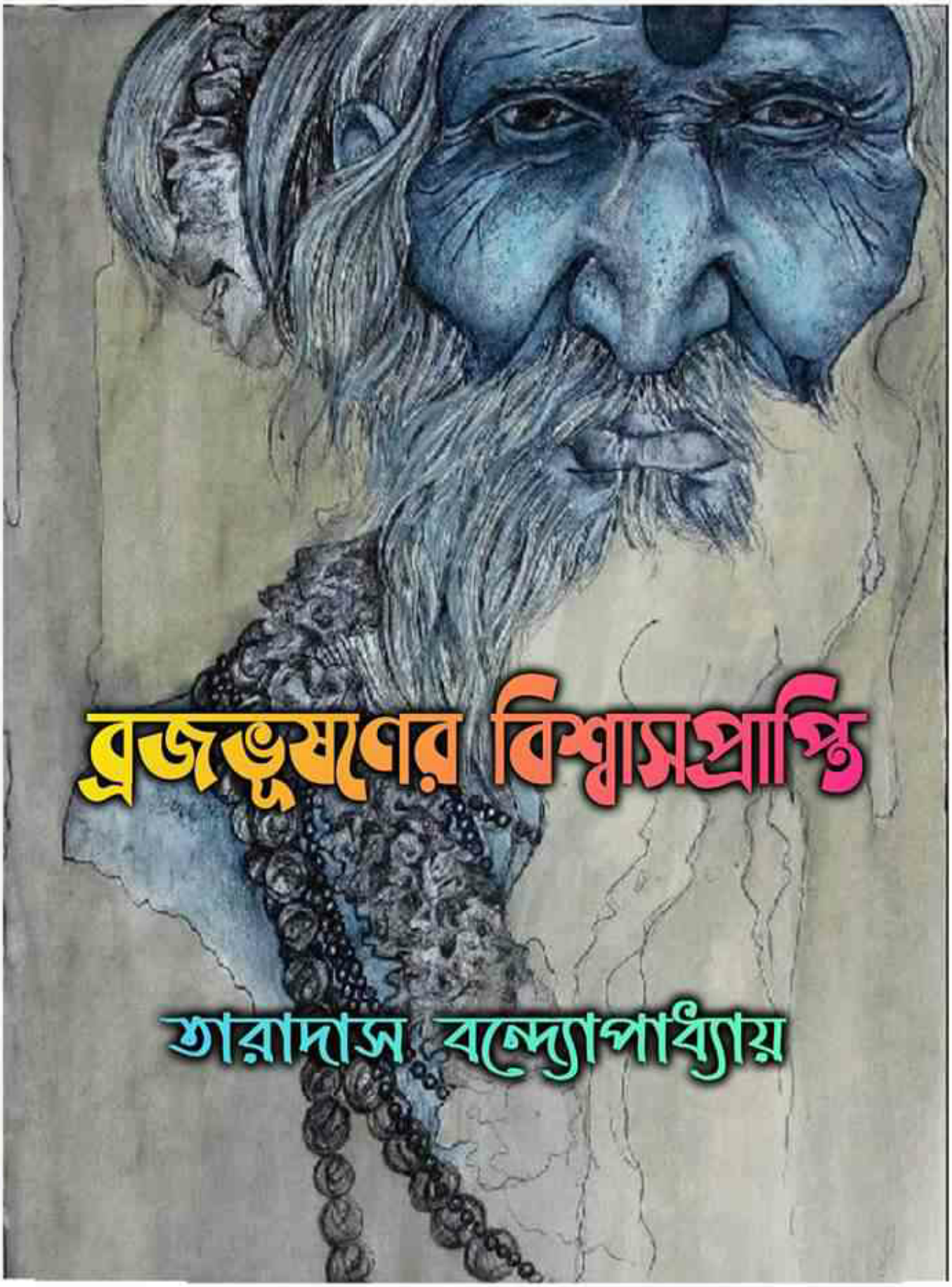

boidownload24.blogspot.com

ব্রজভূষণের বিশ্বাসপ্রাপ্তি

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোরীদের মেসে সম্প্রতি এক ভয়ানক নাস্তিক এসে ভর্তি হয়েছেন। ভদ্রলোকের বয়েস বছর চল্লিশ, মধ্য কোলকাতার কোনো এক কলেজে বিশুদ্ধ গণিত পড়ান। রোগা, ফর্সা চেহারা--দাড়ি গোঁফ সব নিপুণ ভাবে কামানো। ঝকঝকে চোখে যুক্তির ইস্পাত মাঝে মাঝেই তর্কের আলোয় চমকে উঠছে। নাম ব্রজভূষণ চক্রবর্তী। ছুটিছাটার দিন বিকেলে কিশোরীর মেসে আমাদের জমাট আড্ডা বসে, মুড়ি আর তেলেভাজা সহযোগে দুনিয়ার যত অসম্ভব গল্পের আদানপ্রদান হয়। ব্রজভূষণ আসার পর আমাদের সে আজ্ঞা একেবারে মাটি হবার যোগাড়।

অন্ধকার পাড়াগাঁর পথে হাঁটতে গিয়ে পাশের জঙ্গলে সাদামত কিছু নড়তে দেখার ব্যাপারটা চিরন্তন ভৌতিক ঘটনা, যে কোনো আড্ডায় কেউ না কেউ এমন একটা গল্প বলবেই। এর থেকেই পরবর্তী আসল গল্পগুলো আসতে শুরু করে। আমরাও নির্বিবাদে শুনে যাই। যখন কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক মশাই কোলরিজের ‘রাইম অফ দি অ্যানসেন্ট ম্যারিনার' পড়াতে গিয়ে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ-এর কথা বলেছিলেন। সেই মানসিকতা খাটিয়েই এসব গল্প শুনি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি বলে নয়। আজ্ঞায় আজকাল এমন গল্প শুর হলেই ব্রজভূষণ চক্রবর্তী বলেন—

আরে মশাই! ওসব হল পিওর হ্যালুসিনেশন—ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। গাঁজাখুরি গল্প শুনে আর ছোটবেলা থেকে কতগুলো অমূলক কুসংস্কার মনে গেঁথে রেখে আমাদের এই দশা হয়েছে। এমন দেখতে চাই বলেই এমন দেখি।

কিশোরী বলে-তাহলে ব্যাখ্যার অতীত বলে কিছু নেই ?

না, নেই। মুখে নিজেদের যতই যাবাদী বলে প্রচার করি না কেন, মনের গভীরে আমাদের একটা আমি সত্তা আছে—সেটা হাঁচি-টিকটিকি অমাবস্যা বারবেলা সবই মানে। এই সত্তাই আমাদের ব্যাখ্যা খুঁজতে বাধা দেয়।

--আপনার ক্ষেত্রে সেটা কাজ করে না?

মৃদু, হেসে ব্রজভূষণ বলেন- করতো। যুক্তিবাদী চিন্তা দিয়ে, চর্চা দিয়ে সে সত্তাকে আমি জয় করেছি।

নলিনাক্ষ ভট্ট ওধার থেকে বলে উঠলেন--তার মানে আপনি বলতে চান কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে আপনি ঈশ্বরকে ডাকেন না?

মা-কালীর কাছে স'পাঁচখানা পুজো মানত করেন না ?

তক্তাপোশে পাতা শীতলপাটির ওপর শরীরের ঊর্ধ্বাংশ এলিয়ে দিয়ে ব্রজভূষণ বললেন সাধারণত করি না। তবে মিথ্যা বলব না, তেমন এমন টাইট কর্ণারে পড়লে কখনোসখনো যে

অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক কাজ করে ফেলি না তা নয়। এই তো গত বছরই দেশের বাড়িতে মেয়ের জ্বর হল। একদিন দুপরে হঠাৎ জ্বর উঠে গেল একশো ছয় ডিগ্রী। বাড়িতে কান্নাকাটি চলছে, মেয়ে বুঝি আর বাঁচে না। এ সময়ে ডাক্তাররা বরফজলে স্নান করিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে বরফ পাবো কোথায় ? ভেজা গামছা দিয়ে মেয়ের গা মুছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার মনের অবস্থা ভাবুন! ওই জ্বর বেশিক্ষণ থাকলে ব্রেনের সেল চিরকালের জন্য ড্যামেজ হয়ে যাবে। অথচ কিছুই করার নেই। এই সময়ে আমার মেজকাকিমা বললেন—ব্রজ, পরেশকে বল, পীরবাবার দরগা থেকে দৌড়ে জলপড়া নিয়ে আসুক। কোনো ভয় নেই, পীরবাবার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে--

এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু তখন আমি সাহস বজায় রাখতে পারি নি। কাকিমার কথা মেনে নিয়ে খুড়তুতো ভাই পরেশকে জল পড়া আনতে পাঠাই—

নলিনাক্ষ ভট্ট বললেন--তবেই দেখুন, আপনিও আসলে বিশ্বাস করেন।

ব্রজভূষণ বললেন--আদৌ নয়। এটা স্বাভাবিক হিউম্যান রিঅ্যাকশন, সেরিব্রাল

ফাংশন নয়।

—কিন্তু জলপড়ায় মেয়ে সেরে তো উঠল ?

—সেরে উঠল, তবে জলপড়ায় নয়, নিজের সিস্টেমের কেরামতিতে—

—আপনি প্রমাণ করতে পারেন জলপড়ায় কোনো কাজ হয় নি ?

নিজের বিশিষ্ট উচ্চাশের হাসিটা দিয়ে ব্রজভূষণ বললেন, পারি না।

কিন্তু আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, জলপড়াতেই অসুখ সেরেছিল?

নলিনাক্ষ ভট্ট চটে উঠে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম - তর্ক থাক। ব্রজবাবু, আমি আপনাকে এমন একজন মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি, যাঁর ক্ষমতা দেখলে আপনার অবিশ্বাস হয়ত আর থাকবে না।

যাবেন ?

ব্রজভূষণ বিদ্রপ-বঙ্কিম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কোনো বাবাজি-টাবাজি বুঝি ? ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়া কিম্বা জলে-ডোবা দুর্ঘটনার কথা হাত দেখে বলে দেবেন ? নাকি আগামী চৈত্রে যে ফাঁড়াটা আছে তার জন্য শ্বেত বিড়ালের মল মাদলি করে পবতে বলবেন?

ভদ্রলোকের রঢ়তায় মনে ব্যথা পেলেও হেসে বললাম—না, বাবাজি নয়, গৃহী সাধক। তিনি আপনার কাছে পয়সাও চাইবেন না, মাদুলিও বিক্রি করবেন না

boidownload24.blogspot.com

—প্রথমে করবেন না। তারপর আমার বিশ্বাস জমে গেলে একদিন মহা-মৃত্যুঞ্জয় কবচ বানাতে দুশো টাকার যজ্ঞ করতে বলবেন। এসব বুজরুকি আমার খুব জানা আছে মশায়--

এবার একটু, কড়া সুরেই বললাম—ব্রজবাবু, আমি যাঁর কথা বলছি তাঁকে আপনি চেনেন না। অনর্থক একজন অজানা মানুষের নামে অপবাদ দিচ্ছেন কেন ? সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ ভণ্ড থাকতে পারে, তা বলে কি সবাইকে অবিশ্বাস করা উচিত?

তামার কড়া সরে বিন্দুমাত্র ন্য দমে ব্রজভূষণ বললেন—অর্থাৎ এই সাধক বাবাজি আমার কাছে একটা আননোন কোয়ান্টিটি, একে তাই আমার বেনিফিট অফ ডাউট দিতে হবে, কেমন? ঠিক আছে, চলুন-একবার আলাপ করেই আসা যাক। কোথায় যেতে হবে ?

বললাম—আজই বিকেলে চলুন না--

--আজই? কোলকাতায় নাকি?

-কোলকাতায়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তৈরি হয়ে থাকবেন, আমি এসে নিয়ে যাবো। কিশোরীও যাবে নাকি?

কিশোরী এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল—যাবো বইকি, নিশ্চয়ই যাবো। ব্রজবাবু যক্তি দিয়ে থই পাচ্ছেন না, এ জিনিস না দেখলে চলে ?

ব্রজভূষণ কিশোরীর দিকে একবার অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বেলা হয়েছিল। তখনকার মতো বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় ফিরলাম।

কিশোরী আর ব্রজভূষণকে নিয়ে বিকেল পাঁচটার পর যখন তারানাথের বাড়ির দরজায় হাজির হলাম, তখন আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসে টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তারানাথ আর আমাদের মধ্যে কেমন একটা বৃষ্টির যোগ আছে।

চড়চড়ে রোদ্দুরে ভর দুপুরে ঠিক করলাম বিকেলে তারানাথের বাড়ি যাবো।

বিকেলে বেরবার সময় ঠিক দেখি আকাশ কালো, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। তারানাথের বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি নামে।

বাড়ির দরজার ওপর টাঙানো বিবর্ণ সাইনবোর্ডটা দেখে ব্রজভূষণ মুখের একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলেন।

কড়া নাড়তে তারানাথের মেয়ে চারি ওরফে চারুপ্রভা এসে দরজা খুলে দিল।

বললাম—ভাল আছ চারি ?

বাবা বাড়িতে আছেন ?

চারি মেয়েটি সুদশনা। খুব ফর্সা বা খোদাই করা চোখ-মুখ না হলেও আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত মেয়ের থেকে চারি একটু আলাদা। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে শরীরে যৌবনের আগমন সচিত হলে সব মেয়েকেই কিছু পরিমাণে শ্রীমণ্ডিতা বলে মনে হয়, কিন্তু চারির সৌন্দর্য অন্যরকম।

সে শান্ত এবং ধীর। বড় বড় চোখের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা । অচঞ্চল আর সংযত হাবভাব তাকে একটা এমন অনন্য মহিমা দান করেছে, যেটা ব্যক্তিত্বের প্রভা হিসেবে তার উপস্থিতিকে সব সময় ঘিরে থাকে। এতটুকু মেয়ের পক্ষে ব্যাপারটা সম্ভ্রম জনক। প্রথম যখন তারানাথের বাড়িতে আসি তখন চারি পাঁচ-ছ' বছর বয়স। চোখের সামনে মেয়েটাকে বড় হতে দেখে ইদানীং একটু, শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। নববর্ষার জলে পুষ্ট মালতীলতার মতো বেড়ে উঠেছে চারি, তারানাথ এখনো এর বিয়ের উদ্যোগ করছ না কেন?

আমাকে আর কিশোরীকে দেখে চারির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

--কাকাবাবু, মধ্যে অনেক দিন আসেন নি যে? আসুন—

কাজে ব্যস্ত ছিলাম না। আমরা বসি, তুমি বাবাকে ডেকে দাও -

ব্রজভূষণ শিক্ষিত লোক। আমাদের প্রতি নিক্ষিত তার শাণিত শরবর্ষণ একটু বেশি প্রখর হয়ে পড়লেও তার ভেতর কোনো হীনতা ছিল না। চারিব উপস্থিতিতে তিনি কোনো কথা বলেন নি, এবার সে বেরিয়ে যেতে চারদিকে তাকিয়ে বললেন—এই তাহলে গ্রেট ম্যানের ঘর ?

তারানাথের বসবার ঘরের সাজসজ্জা গৃহস্বামীর সাম্প্রতিক অবস্থা বিপর্যয়কে প্রকট করে তুলেছে। চটা-ওঠা এবড়ো-খেবড়ো সিমেন্টের মেঝে, নড়বড়ে তক্তাটপোশে জীর্ণ শীতলপাটি, প্রায় এক যুগ চুনকাম-না-হওয়া দেওয়ালে নোনাধরা দাগ। পাল্লায় কাচভাঙা আলমারিতে বোঝাই অজস্র পুরনো পঞ্জিকা।

কিশোরী দুঃখিত গলায় বলল—ভালো মানুষের ধনীও হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ব্রজভূষণবাবু- কথাটা বলে ফেলেই ব্রজভূষণ বোধহয় লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন- মানে—আমি কথাটা ঠিক সে অর্থে—আমি বলছিলাম যে--

এমন সময়ে তারানাথ বাড়ির ভেতর থেকে বসবার ঘরে এসে ঢুকল ।

-এই যে, তোমরা এলে তাহলে! এতদিন ছিলে কোথায় ? ইনি কে?

আমরা যথাবিধি ব্রজভূষণের সঙ্গে তারানাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর কিশোরী বলল—আজ কিন্তু আমরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

তারানাথ একটু অবাক হয়ে বলল--উদ্দেশ্য ? কি উদ্দেশ্য?

--আমাদের ব্রজবাবু, যুক্তি দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় না, তা বিশ্বাস করেন না। পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর—কিছুই না। তাই তারানাথ হেসে বলল সে তো ওঁর নিজস্ব ব্যাপার। তার জন্যে হঠাৎ আমার কাছে এলে কেন?

এবার আমি বললাম—দেখুন, পথিবীতে সত্যিই নাস্তিক মানুষ অনেক আছেন। তাঁদের সবাইকে বিশ্বাসী করে তোলা আমাদের ব্রত নয়। কিন্তু ব্রজবাবু, আমাদের বন্ধু, আর আপনিও আমাদের ঘনিষ্ঠ। তাই সুযোগটা ছাড়লাম না।

আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন—

-না ভাই, আমি কি করব? আমি কিছু জানি না

-না, মানে যদি অন্তত ওঁর জীবনের এমন কিছু ঘটনা বলে দেন যা অন্য কারো জানবার কথা নয়, বা ওইরকম কিছু তারানাথের এই ঘরে বসে এমন ঘটনা আমরা অনেক ঘটতে দেখেছি। কিন্তু আজ তারানাথ নিতান্ত কঠোর। কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলাম না। লজ্জিত মুখে বসে রইলাম।

ব্রজভূষণ বললেন –আপনাদের বিব্রত হবার কোনো কবিণ নেই। বিশ্বাস ব্যাপারটা এক ধরনের ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা। সামাজিক, শিক্ষাগত এবং পারিবারিক বিশেষ আবেষ্টনী এটাকে গড়ে তোলে। সেই অকারণ বিশ্বাসের ফলে এই ভদ্রলোকের ওপর আপনারা এমন কিছু অবাস্তব গুণ আরোপ করেছেন যার অস্তিত্ব কেবল আপনাদের মনেই। দোষটা আমাদের নয়, ঔরও নয়। অল্পবয়েস থেকে কার মানসিকতা কিভাবে গড়ে উঠছে তার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে।

তারানাথের দিকে তাকিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—মার্জনা করবেন, আমি এর দ্বারা আপনার প্রতি কোনো কটাক্ষ করি নি। কারো যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা না থাকে না থাকাটাই স্বাভাবিক—তবও তাঁর সৎ এবং ভালো মানুষ হতে বাধা নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা করার জন্য এরা কয়েকটি অতিরিক্ত গুণ আপনার ওপর আরোপ করেছেন, কিন্তু সেজন্য আপনি দায়ী নন—অমায়িক হেসে তারানাথ বলল—সে তো ঠিকই। ঠিকই তো, আমরা মরমে মরে গেলাম। যারা কোষ্ঠীবিচার করাতে কিম্বা হাত দেখাতে আসে তাদের তারানাথ মাঝে মাঝে দু'একটা আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়ে অবাক করে দেয়। তার এই বৈঠকখানায় বসে সে জিনিস এই ক'বছরে কতবার দেখেছি। আজ আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও তার নিরুত্তাপ ব্যবহার আমাদের নিদারুণ অপ্রস্তুত করল।

তারানাথ একজন সাধারণ মানুষ এবং তার ভেতরে কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে ব্রজভূষণ তারানাথের সঙ্গে নানান সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। আমাদের ইচ্ছে ফলবার আর কোনো আশা নেই দেখে হতাশ হয়ে বললাম আমাদের কথা তো রাখলেন না, অন্তত একটু, চা খাওয়ান।

তারানাথ বলল-চায়ের কথা বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু তোমাদের এই বন্ধুটির হয়তো সময় হবে না। সেজন্যই আগে বলি নি--

ব্রজভূষণ অবাক হয়ে বললেন আমার। আমার সময় হবে না কেন ? মানে, চা খাবো বলে বলছি না—কিন্তু আমার তো এখন কোনো কাজ নেই-

তারানাথ শান্তভাবে বলল—কাজ কখন আসে তা কি আগে থেকে বলা যায় ?

চা করতে বলি তাহলে?

ব্রজভূষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন - বলুন।

বাড়ির ভেতরে চা করতে বলে এসে তারানাথ ভাঙা আলমারির পাল্লা খুলে মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া সাদা কাগজ বের করল। সমাগত ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে বসে হস্তরেখা বা কোষ্ঠীবিচার করার সময়ে তারানাথ এর থেকে কাগজের স্লিপ নিয়েই হিসেবনিকেশ করে, ব্যবস্থাপত্র দেয়। একটুকরো কাগজে কি লিখে ভাঁজ করে একখানা খামে পুরে গদের আঠা দিয়ে খাম বন্ধ করল তারানাথ, তারপর ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি তো শিক্ষিত ব্যক্তি, অধ্যাপনা' করেন। আপনাকে একটা কথা দিলে রাখবেন আশা করি ?

ব্রজভূষণ একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন-কথা দিলে অবশ্যই রাখব।

কিন্তু কি কথা দিচ্ছি সেটা আগে জানা দরকার।

--নিশ্চয়ই। এই মুখবন্ধ খামটা আমি আপনাকে দিচ্ছি, আজ থেকে ঠিক পনেবো দিন পরে রবিবার বিকেলে এটা নিয়ে আপনি আমার এখানে আসবেন।

আপনাকে শুধু, কথা দিতে হবে যে, এর মধ্যে আপনি এ খাম খুলবেন না। ঠিক আছে ?

ব্রজভূষণ না-বোঝার দষ্টিতে তাকিয়ে বললেন কেবল এই? খামটা নিয়ে যাবো, আবার পনেরো দিন পরে আপনার কাছে নিয়ে আসবো?

--এবং এর ভেতরে সেটা খুলবেন না।

--বেশ। কিন্তু কেন ?

তারানাথ হেসে বলল—কারণ কি একটা থাকতেই হবে। মনে করুন না,

একজন বৃদ্ধের অনুরোধে একটা অকারণ কাজ করছেন।

খামটা হাতে নিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—ঠিক আছে। পনেরো দিন পরে এটা নিয়ে আমি আপনার কাছে আসব।

কি হচ্ছে বুঝতে না পারলেও কিশোরী আর আমি তখন কৌতুহলী হয়ে উঠেছি। কিশোরী বলল সেদিন কিন্তু আমরাও আসবো।

তারানাথ বলল--আসবে বইকি। তোমরা না এলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

এমন সময় চারি একখানা খাবার থালায় চারটে চায়ের পেয়ালা এনে আমাদের সামনে তক্তাপোশের ওপর রেখে গেল।

পেয়ালা হাতে নিয়ে সবে চুমুক দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ বাইরে থেকে কে ডাকল

—ব্রজভূষণবাবু, এখানে আছেন নাকি ?

পেয়ালা নামিয়ে রেখে বিস্মিত হয়ে ব্রজভূষণ বললেন—এখানে আমাকে কে খোঁজ করতে এল?

কিশোরী বলল—আমি দেখছি।

একটু পরেই তার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো রমেন। সে কিশোরীদের মেসের একজন মেম্বার।

ব্রজবাবু, বললেন--আরে! আপনি এখানে ? কি ব্যাপার ?

রমেন বললপ্রজবাব, আপনি একবার মেসে চলন। কিশোরী এখানে গল্প করতে আসে জানি, আজ দু'জনে একসঙ্গে বেরলেন--ভাবলাম এখানে হয়তো পাওয়া যাবে। তাই একবার চলুন আমার সঙ্গে--

তার মুখের ভাব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রজভূষণ বললেন—কি হয়েছে রমেনবাবু ?

কোথায় যাবে আপনার সঙ্গে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেন বলল—আপনি বেরিয়ে আসবার একটু পরেই আপনার একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। আমিই সই করে নিয়েছি।

ব্রজভূষণ ব্যগ্র হয়ে বললেন -কি, কি আছে টেলিগ্রামে ?

-আপনার মায়ের খুব অসুখ। টেলিগ্রাম করেছে আপনার ছোট ভাই।

ব্রজভূষণের মুখে বিবর্ণ হয়ে গেল। তক্তাপোষ থেকে পা নামিয়ে ব্যস্ত হয়ে চটিতে পা গলাতে গলাতে বললেন—সে কি! মায়ের অসুখ। আমার তো তাহলে এখনি রওনা দিতে হয়। ও কিশোরীবাবু, আপনার কাছে তো ঘড়ি আছে, একবার -

দেখুন দেখি-সওয়া সাতটার গাড়ি ধরতে পারবো কি? রমেনবাবু, সত্যি করে বলুন, খাবাপ কিছু নয় তো মা আছেন তো ?

না না, সে-সব কিছু নয়। চলন, গিয়ে তো নিজের চোখেই টেলিগ্রাম দেখবেন।

ঘড়ি দেখে কিশোরী বলল-খুব তাড়াতাড়ি করলে হয়তো গাড়িটা পেতে পারেন। এক কাজ করুন, একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিন এখান থেকেই।

মেসে গিয়ে চট করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন, তারপর ওই গাড়িতেই একেবারে ইস্টিশন চলে যাবেন-

ব্রsteজভূষণ তারানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—এভাবে হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ভাল করে পরিচয় করার সুযোগ হল না। ফিরে এসে বরং একদিন আপনার কাছে—এখন গিয়ে ভাল খবর পেলেই বাঁচি।

তারানাথ বলল—ফিরেই কিন্তু আসবেন একদিন। পনেরো দিন বাদে আপনার তো আসার কথাই রয়েছে। আজ আপনার চা খাওয়াও হল না ।

খেতে গিয়েও নামিয়ে রাখা চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—হ্যাঁ, আজ আর সময় হল না। সামনের দিন বরং—-

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়ে ব্লজভূষণ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তারানাথের দিকে তাকালেন।

তারানাথও ঠোঁটের কোণে মৃদু, হাসি নিয়ে ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে আছে।

সত্যিই ব্রজবাবর চা খাওয়ার সময় হল না।

কিশোরী তাড়া দিল—চল হে, চলুন ব্রজবাবু। এরপর আর ট্রেন ধরতে পারবেন না।

মেসে আসবার পথে ঘোড়ার গাড়িতে ব্রজভূষণ কয়েকবার আপন মনেই বললেন-কোইন্সিডেন্স। কোইন্সিডেন্স...

ব্রজভূষণকে আমরা দু'একজন সঙ্গে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। কথা রইল, গিয়েই ওখানকার সংবাদ জানিয়ে উনি আমাদের চিঠি দেবেন।

দিনসাতেক বাদে দেশ থেকে ব্রজবাবুর চিঠি এল। তাঁর মায়ের সন্ন্যাস রোগের আক্রমণ হয়েছিল, বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না। যাই হোক, এখন তিনি অনেকটা সামলে উঠেছেন। তাঁকে আর একট, সুস্থ করে ব্রজবাবু ফিরবেন।

আরো এক সপ্তাহ কাটল। রবিবার সকালে কিশোরীর মেসে গেলাম ব্রজভূষণ ফিরেছেন

কিনা খবর নিতে।

না, ব্রজবাব ফেরেন নি। আর কোনো চিঠিও আসে নি।

কিশোরী বলল—আজ বিকেলে কিন্তু আমাদের তারানাথের বাড়ি যাবার কথা। এদিকে ব্রজবাবু, তো এসে পৌছুলেন না। কি করবে?

—বিকেল অবধি দেখ । উনি না এলে আমরাই অন্তত যাই।

—বেশ। আমি তাহলে আর এখানে আসব না, সরাসরি তারানাথের বাড়ি চলে যাবো। তুমিও ওখানেই চলে যেও বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা দুজনেই মট লেনে গিয়ে হাজির হলাম।

তারানাথ বৈঠকখানা ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমাদের দেখে বলল—এস, এস।

ভাবছিলাম তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন।

-আপনার মনে ছিল আজ আমাদের আসার কথা ?

--মনে ছিল। বোসো জমিয়ে। চা খাবে?

হেসে বললাম--আজ আবার বাধা পড়বে না তো ?

তারানাথও হেসেই বললন, আজ আর বাধা পড়বে না।

কিছুক্ষণ বাদেই চারি এসে চা দিয়ে গেল। এর মধ্যে ব্রজবাবুর মা যে ভাল আছেন, সে কথা আমরা তারানাথকে জানিয়ে দিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম—একটা কথা বলি। একট, হয়তো অনধিকারচর্চা হয়ে যাবে, রাগ করবেন না। চারির তো বিয়ের বয়েস হল, ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন না কেন ?

প্রশ্নটা শুনে তারানাথ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কিশোরী পাসিং শো-এর প্যাকেট বের করে তারানাথের সামনে রেখেছে। তার থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে অন্যমনস্ক ভাবেই তারানাথ বলল-মনে করার কিছু নেই, তোমরা ঠিকই বলেছে। মেয়ের বয়েস হচ্ছে, বিয়ে তো দিতেই হবে। তাছাড়া তোমরা চারিকে ছোটবেলা থেকে দেখছো, তোমাদের অধিকার আছে বইকি--

খানিকক্ষণ চুপ করে সিগারেট টেনে তারানাথ বলল-চারির বিয়ের জন্য খোঁজখবর করার একটা অসুবিধে আছে।

শুনে একটু থমকে গেলাম। চারি বেশ সুন্দরী মেয়ে, তার বংশগৌরবও ভাল। হাতের কাজেও সে নিপূণা। এ মেয়ের বিয়েতে কি অসুবিধে থাকতে পারে?

ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকেলের মালায় সিগারেটের দেহাবশেষ গুঁজে দিয়ে তারানাথ বলল ব্যাপারটা তোমাদের খুলেই বলি, গল্পের মতো লাগবে শুনতে। শুনবে নাকি?

অবশ্যই শুনবো। গল্পের লোভেই তো এখানে আসা।

চারি এসে একখানা পতলের রেকাবিতে পান আর মশলা রেখে গেল। আজ সে একটা হলদে তাঁতের শাড়ি পরেছে, টান টান করে চুল বেধেছে, কপালে খয়েরের টিপ। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, এর চেয়ে বেশি সাজ কোথা থেকে করবে ? কিন্তু তাতেই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে চারিকে। বললাম—হ্যাঁ রে, আজ এত সেজেছিস যে? কোথাও যাবি নাকি?

সে লজ্জিত মুখে মাথা নেড়ে বাড়ির ভেতরে পালিয়ে গেল।

তারানাথ বলতে শুরু করল- আমার প্রথম যৌবনের ঘটনা তো তোমাদের কিছু কিছু বলেছি। সে-সব বড় আশ্চর্য দিন গিয়েছে। সংসারে মন নেই, বৈষয়িকতায় মন নেই, একটানা কোথাও বেশিদিন থাকতে ইচ্ছে করে না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই গ্রামে-গঞ্জে, বন-পাহাড়ে।

একবার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বাংলা দেশ আর বিহারের সীমানায় একটা ছোট্ট গ্রামে রাত্তিরের আশ্রয় নিয়েছি। গ্রাম বলতে দশ-বারোটা খোড়া চালের বাড়ি মাত্র। গ্রামের প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল। এক গোয়ালার বাড়ি থেকে মাটির ভাঁড়ে সেরখানেক দুধ কিনে কাছের পাহাড়টার ওপর চলে গেলাম রাত কাটাবো বলে। গাঁয়ের মোড়ল অবশ্য বলেছিল তার বাড়ি থাকতে, কিন্তু বাড়ির আরামই যদি চাইবো তাহলে আর পথে বেরিয়েছি কেন?

পাহাড়ের ঢালুতে ঘন জঙ্গল। তবে বিহারের দিকে যেমন হয়, বড় বড় গাছ আছে অনেক, কিন্তু গাছের নিচে বাংলা দেশের মতো ঝোপঝাড় নেই।

একেবাবে তকতকে পরিষ্কার। সেখানেই একটা চৌকো পাথরের ওপর আস্তানা

গড়লাম।

ক্রমে রাত্তির গভীর হতে লাগল। সঙ্গে দেশলাই ছিল, শুকনো কাঠকুটো যোগাড় করে আগুন জেলে দুধটা জলি দিয়ে এখয়ে নিলাম। কিটকিট করে একধরনের পোকা ডাকছে বনের মধ্যে, ঝিরঝিরে বাতাস বইছে সন্ধ্যে থেকে।

বোধহয় সেইজন্যেই মশা নেই আদৌ। রোজ রাত্তিরে কিছুক্ষণ ধ্যানের অভ্যেস করেছিলাম। কোনো বিশেষ দেবতার মতি কল্পনা বা মন্ত্রজপ নয়, এমনি চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে মনকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করতাম। ঘণ্টা দুই-তিন পাথরের টুকরোর ওপরে বসে মনকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তর্মুখী চেতনার স্রোতে যুক্ত করলাম। যখন ধ্যান শেষ করে চারদিকে তাকালাম, তখন নিশ্চয় মধ্যরাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু বনের মধ্যে চুইয়ে আসা অজস্র নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলো জ্যোৎস্নার অভাব দূর

করেছে। নিচে গ্রামের বাড়িগুলোতে আলো নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দেহাতে এত রাত্তিরে কেউ জেগে থাকে না। কান পেতে থাকলে মাঝে-মধ্যে দু'একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। কি সুন্দর শান্তি ছড়িয়ে আছে পরিবেশে! আমি কবি নই, এসব বর্ণনা যে কাব্য করে দিচ্ছি তা ভেবো না। মাথার নিচে পুটলিটা নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম পাথরের ওপর। শাল আর সেগুনের ধনে বাতাস লেগে কেমন একটা উদাস বাজনার মতো শব্দ হচ্ছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রের ভিড়। কবেকার কি সব কথা যেন আবছা আবছা মনে পড়ে যায়। অথচ পুরোপুরি মনে আসে না।

গতজন্মের স্মৃতি কি? হবেও বা—

সারারাত ওই অরণ্যের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থেকে এক স্বর্গীয় শান্তি নেমে এল আমার মনে। এটাকেই আমি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বলছিলাম। ওই নির্জনতা, ওই রহস্যময় রাত্রি, নক্ষত্রের দল যেন আমাকে সষ্টির আদিম মুহূর্তে নিয়ে গেল। এই আকাশ-অরণ্য-মাঠ-নক্ষত্র আর বিশ্বজগৎ তৈরি হবারও আগের সময়ে যখন সমগ্র সৃষ্টিটাই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে।

দৈবী আনন্দে মন ভরে উঠল। মনে হল—কিছুই তো কিছু নয়। ঐশ্বর্য, খ্যাতি, ক্ষমতা—কিছুই তো আমাকে এই অনিন্দের সন্ধান দিতে পারবে না। আমি সেই পাথরের ওপর শুয়েই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার কিচ্ছু হবে না। অন্তত সাধারণ মানুষ বা এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও যাকে 'কিছু হওয়া' বলে তা আমার জীবনে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে আনন্দ বুকের ভেতর অনুভব করলে পার্থিব আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই আনন্দের এক চমক দেখতে পেয়ে, ছিলাম সেদিন। বাকি জীবনটা তারই সন্ধানে ব্যয় করেছি। নইলে সাধনার মাধ্যমে যাঁদের দেখা পেয়েছি, তাঁরা আমাকে ভোগ এবং ঐশ্বর্যের চরম বর দিতে পারতেন।

কিন্তু সে প্রার্থনা আমি করি নি। এবার নিশ্চয় তোমরা প্রশ্ন করবে, যার জন্য অন্য সব পার্থিব কামনার বস্তু ত্যাগ করলাম সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছি কিনা।

পরিপুর্ণ ভাবে পাই নি। চলার পথের বাঁকে কখনো কখনো এমনি পাহাড়ের চড়ায়, কিম্বা আঁকাবাঁকা নদীর ধারের মহাশ্মশানে রাত কাটাতে কাটাতে পরম সতোর আনন্দময় সংগীতের একটুকরো ভেসে এসেছে মনে—তাতেই জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে।

মনের এই অবস্থাতেই প্রথম মধুসুন্দরীর দেখা পাই। সে গল্প তো তোমরা জানো। ঘুরতে ঘুরতে একজন সিদ্ধ পুরুষের সন্ধান পেয়েছিলাম। পাহাড়ের গুহায় থাকেন, গোর পাশেই বনের মধ্যে তাঁর সিদ্ধাসন—পঞ্চমীর। সাধুজী প্রায়ই অনেক রাত অবধি পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে থাকতেন। একবার যেন দুর থেকে সাধুজীকে দেখেছিলাম মাঝরাতে একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে কথা বলতে।

একটু অবাক হয়েছিলাম। ক'দিনের সাহচর্যেই যতদূর বুঝেছিলাম, সাধুজীর চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র এবং নির্মল। তবে ওই মেয়েটি কে? অত রাতে সে কেন আসে, দিনের বেলা যখন আসার সুযোগ আছে ?

এর কিছুদিন বাদে সাধুজী কয়েকদিনের জন্য শিষ্যবাড়ি গেলেন। আমি একা রইলাম গুহার আস্তানায়। প্রথম রাতেই কি মনে হল কি জানি, সিদ্ধ আসনের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য পঞ্চমুণ্ডীর আসনে গিয়ে বসলাম। সেই রাত্রিরেই, আসনে বসে থাকা অবস্থাতেই আমি মধুসুন্দরী দেবীর দেখা পাই।

একটু একটু করে সমস্ত বনভূমি ভরে উঠল আশ্চর্য দৈবধুপের গন্ধে, পথিবীর কোনো চেনা সুবাস সে নয়। কেমন যেন নেশা-নেশা মনে হতে লাগল। তারপরই অরণ্যের একাংশ আলো করে মধুসুন্দরী দেবী আবির্ভূত হলেন। সে ত্রিভুবন-বিজয়ী রুপ মানুষের হয় না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, এর কিছুদিন পরে আমি সাধুজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। উনিই বলেছিলেন—যাঁকে দেখেছ, তিনি মধুসুন্দরী দেবী।

অনেক ভাগ্য থাকলে ওর দেখা পাওয়া যায়। তুমি যদি ওর সাধনা করতে চাও তাহলে আমি তার মন্ত্র এবং প্রক্রিয়া বলে দিচ্ছি। কিন্তু আমার এখান থেকে তোমাকে চলে যেতে হবে। এক আসনে দু'জন সাধকের স্থান হয় না।

সাধুজীর কাছ থেকে চলে এসে বরাকর নদীর ধারে এক শালবনে আস্তানা গাড়ি। দীর্ঘ সাধনার পর একদিন সাধুজীর নির্দেশমতো অমাবস্যার রাত্রিতে আঙট কলাপাতায় পোড় শোল মাছের নৈবেদ্য দিয়ে হোম করে পূর্নাহুতি দিই।

এর কয়েকদিন বাদে গভীর রাতে মধুসুন্দরী দেবী দেখা দেন। সাধু বলে দিয়েছিলেন, দু ভাবে দেবীকে লাভ করা যায়—ভার্যা রূপে অথবা কন্যা রূপে।

কন্যা রূপে চাইবার বয়েস সেটা নয়। ফলে এর পরের তিন-চার মাস দেবী আমার জীবন অলৌকিক মাধুর্যে ভরে দিয়েছিলেন। শরীরী প্রেম নয়, আসক্তি কতক্ষণ আর থাকে? শরীরী কামনার অনেক উর্ধ্বে ভালবাসার সন্ধান পেয়ে, ছিলাম সেই দিনগুলিতে।

কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। বাড়ির লোক আমার সন্ধান পেয়ে বরাকর নদীর ধারের সেই শালবন থেকে জোর করে আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। খুজতে খুজতে বাড়ির লোকেরা যখন আমাকে আবিষ্কার করে, আমি নাকি তখন বনের মধ্যে বসে আপনমনে বিড়বিড় করছি। আমার চুল বড় বড় হয়ে তাতে জট পড়ে গিয়েছে, লম্বা নখের নিচে কালো মাটি। জামা-কাপড় শতছিন্ন। সত্যি সত্যি দড়ি দিয়ে বেধে আমাকে ফিরিয়ে আনা হয়।

সেই বাঁধন ছিড়ে শেষবারের মতো বরাকর নদীর চরে দেবীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি

বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না।

বললাম--কেন দেবী ?

বাড়ি ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই তোমার বিয়ে হবে। জীবনে দ্বিতীয় নারী এলে আর আমার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

—আমি বিয়ে করব না।

দেবী হাসলেন।—অসম্ভব। ভবিতব্য কেউ খাতে পারবে না। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

আমি আকুল হয়ে বললাম—তাহলে? আর কখনো নয়। কোনোদিনও নয়?

দৈবী অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—আমাকে একবার পেলে চিরতরে কেউ হারায় না। আবার আমাদের দেখা হবে--তবে এভাবে নয়, এই রপে নয় ।

-তবে? কিভাবে দেখা হবে বলে দিন দেবী।

--এখন জেনে তোমার লাভ নেই। সময় হলে নিজেই বুঝতে পারবে তারপর বনের মধ্যে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি চললাম । তুমি পালিয়েছ বুঝতে পেরে বাড়ির লোকেরা তোমাকে ধরতে আসছে।

তোমাকে কিছু ক্ষমতা দিলাম। ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে কোনোদিন অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না। আর সময় নেই, চলি।

দেবী অন্তহিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম বনের ভেতর দিয়ে কয়েকটা লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসছে। মনে একটা হাল ছেড়ে দেওয়া হতাশার ভাব, নিবিড় ক্লান্তি। আর পালাবার চেষ্টা না করে একটা গাছের গড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। লোকেরা এসে চিৎকার করে উঠল—এই যে। এখানে বসে আছে!

একজন এসে আমার হাত ধরল। কে যেন বলল বাতাসে কিসের গন্ধ হে?

বেশ গন্ধটা—

আমার হাত বাঁধার জন্য এরা দড়ি নিয়ে এসেছিল। বললাম বাঁধতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। ভয় নেই, আর পালাবো না।

বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন সকালে গাঁয়ের কেষ্ট নাপিত এসে আমার দাড়ি- গোঁফ কামিয়ে চুল কেটে দিল। বেশ কিছুদিন আমার মনের কোনো প্রকৃত প্রাণ ছিল না-খেতে হয়, নইলে প্রাণ থাকে না—তাই দু'বেলা খেতে বসি। ঘুম আসে না, তবু, জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করি। কারণ জেগে থাকলে একটা তীব্র ক্ষতির বোধ বুকের মধ্যে হাহাকার জাগিয়ে তোলে। কি অমূল্য জিনিস চিরকালের জন্য হারিয়েছি, আর তা কখনো ফিরে পাব না। আবার ঘুমোল স্বপ্নের ভেতরে ভেসে ওঠে বরাকর নদীর ধারের সেই বালির চর–পূর্ণিমার

জ্যোৎস্নায় অভ্রের কুচি চমকে উঠছে। আলোয়-ছায়ায় মেশা সেই শালবন, উদাস হাওয়া করুন বাজনা বাজাচ্ছে তার পাতায় পাতায়। কিন্তু শুন্য সেই অরণ্য আজ নিপ্রভ, চাঁদের আলো সেখানে ভাল করে খুলছে না। কারণ দেবী আর নেই।

মনে তিক্ত অতৃপ্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতাম।

এই মানসিক অবস্থার ভেতর আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিবাহের কোনো অনুষ্ঠানই আমার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারল না। আবিষ্ট মানুষের মতো যে যা বলল করে গেলাম। পাত্রী আগে থেকেই ঠিক ছিল, আমাদের গ্রামেরই মেয়ে।

আমার জীবনে সবই অদ্ভুত, পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটাও সাধারণ ভাবে ঘটে নি।

ছোটবেলায়, তখন আমার বারো-তেরো বছর বয়েস, সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতাম। নদীতে গিয়ে ঘণ্টাখানেক সাঁতার দিয়ে স্নান না করলে তৃপ্তি হত না।

বর্ষার নদীতে গেরুয়া জলের ঢল নামত, কুটো পড়লে দু'খানা হয়ে যায় এমনি স্রোত। এমন এক বর্ষাকালে মনে সখে জলে ঝাঁপিয়ে স্নান করছি, হঠাৎ পাড় থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের একটা চিৎকার উঠল। সবাই আঙুল দিয়ে নদীর মাঝখানে কি যেন দেখাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি প্রখর স্রোতের টানে একটি সাত আট বছরের মেয়ে অসহায়বভাবে ভেসে চলে যাচ্ছে। ওই টানের মুখে হাতিও ভেসে চলে যাবে। কেউই মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য জলে নামতে সাহস করছে না। তখন অল্প বয়েস, মত্যুর পরোয়া করি না। দুই হাত সাঁতার দিয়ে এগিয়ে মেয়েটির চুলের 'গুছি চেপে ধরলাম। এরপর আর ওই ভয়ানক স্রোতের বাধা কাটিয়ে কিছুতেই ফিরে আসতে পারি না। একা হলে কোনো অসুবিধেই হত না। কিন্তু এক হাতে মেয়েটিকে ধরে রেখেছি—ছেড়ে দিলেই সে ডুবে যাবে। একসময় তো এমন হল, মনে করলাম মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাই। পারলাম না। অতি কষ্টে এক হাতে জল কেটে পাড়ের কাছে এলাম। আর সমস্তক্ষণ গ্রামের একদল লোক ঘাটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাকে উৎসাহ এবং নানারকম পরামর্শ দিয়ে গেল।

কে একজন একটা ধুতি পাকিয়ে ছুড়ে দিল আমার দিকে। তবে তার আর দরকার ছিল না, তখন আমি পায়ের নিচে জমি পেয়ে গিয়েছি।

যাকে বাঁচালাম সে আমাদের গ্রামের হরিদাস ভট্টাচার্যের মেয়ে। এই ঘটনার বছর দুই পরে হরিদাস ভট্টাচার্য কথায় কথায় আমার জ্যাঠামশায়কে বলেছিলেন--

আমার মেয়েটাকে তো তারানাথ বাঁচালো, এবার আপনারা ওকে পায়ে স্থান দিন-অবাক হয়ে জ্যাঠামশাই বললেন তার মানে ?

—আজ্ঞে, আমি তারানাথের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করছি। সে আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে, শাস্ত্রমতে তার প্রাণের মালিক এখন সে-ই।

বিধাতাই এ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

জ্যাঠামশাই তখনকার মতো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন বটে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এসব মজাদার কথা চাপা দিয়ে রাখা কঠিন। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের লোকের এ নিয়ে নানারকম আলোচনা করতে শুরু করল। কেউ বলল—হরিদাসের আক্কেল দেখেছ ! ফাঁকতালে মেয়েটাকে পার করবার তালে আছে। আবার কেউ বলল- ঠিকই তো বলেছে। তারানাথের উচিত মেয়েটাকে বিয়ে করা। মনুসংহিতাতে স্পষ্ট এরকম নির্দেশ দেওয়া আছে।

আসলে এমন হলে বেশ একটা মজা হয়। গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে দু'পাঁচদিন হৈচৈ করবার মতো কিছুই কখনো ঘটে না। আমার বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারলে সবাই মিলে একট, আমোদ করা যায়।

এর ফলে সত্যি কিছু হত কিনা কে জানে, কিন্তু এবারে বাড়ির লোকেরা আমাকে ধরে আনার পর হরিদাস ভট্টাচার্য নতুন উদ্যমে এসে আমার জ্যাঠামশাইকে পাকড়াও করলেন। বিয়ে দিলে আমার পায়ে বেড়ি পড়বে, আমি আর পালাতে পারবে না, এমন একটা ধারণা বাড়ির সকলের ছিল। এদিকে জ্যাঠামশাইয়ের বয়েস হয়েছে, ঘরে ঘরে পাত্রী দেখে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ চট করে বিয়েটার ব্যবস্থা না করলে আমি আবার পালিয়ে যেতে পারি। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে জ্যাঠামশাই হরিদাস ভট্টাচার্যকে কথা দিলেন। তাঁদের বংশ ভাল, মেয়েটিও দেখতে শুনতে ফেলনা নয়—বিয়েতে আপত্তি হবার কোনো কারণ ছিল না। জ্যাঠামশাই প্রথম দিকে যে ইতস্ততঃ করছিলেন, তার কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে শ্বশুরবাড়ি দুরে না হলে জামাইয়ের যথেষ্ট আদর হয় না। অবশ্য এ

ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

তোমরা হয়ত ভাবছ চারির বিয়ের সঙ্গে এ গল্পের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ আছে। সে কথায় আসছি। মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও।

যন্ত্রচালিতের মত বিয়ে করলাম, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি আমার কোনো টান জন্মালো না। সত্যি বলতে কি, প্রথম চার-পাঁচ মাস তার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখি নি। রাত্তিরে বৈঠকখানা ঘরে একটা চাদর আর বালিশ নিয়ে আলাদা শুতে যেতাম। দিনের বেলা ভেতরবাড়িতে আদৌ ঢুকতাম না, পাছে কথা বলতে হয়।

গ্রামের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে এসব কথা চাপা রাখা কঠিন। আস্তে আস্তে লোকেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু, হয়ে গেল। তারানাথ বৌয়ের কাছে ঘুমায় না কেন? এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। অনেকে বলতে লাগল--তারানাথ আবার বিয়ে করবে।

একদিন রাত্তিরে যথারীতি বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে আছি, গরমে কিছুতেই ঘুম আসছে না। হঠাৎ মনে হল ভেতর-বাড়িতে যাবার দরজায় কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তাকে ভাল দেখা যাচ্ছে না—তবে বুঝতে পারছি স্ত্রীলোক, কারণ কাপড়ের খসখস, আর চুড়ির

শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বললাম—কে? কে ওখানে?

উত্তরে দরজার আড়াল থেকে এক ছায়ামতি বেরিয়ে এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে ঠাহর করে দেখলাম— আমার স্ত্রী।

কথা বলতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিদায় করতে গেলেও তো একটা কথা বলে উপায় নেই। জিজ্ঞাসা করলাম--কি চাও?

খব মৃদু, গলায় সে বলল—তুমি ঘরে শুতে যাও না কেন?

বললাম—আমার একটা ব্রত আছে। জানো তো আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলাম।

উত্তরে সে বলতে পারত-ব্রত থাকলে বিয়ে করে আমার জীবন নষ্ট করলে কেন? বিয়ে না করলেই পারতে।

কিন্তু কোন অভিযোগ না করে সে বলল—কাল থেকে ঘরে শুতে যেও।

আমি কথা দিচ্ছি তোমার ব্রত নষ্ট করবো না। লোকেরা পাঁচরকম কথা বলছে।

এসব কথা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে ফিরে চলে গেল।

বিবেচনা করে দেখলাম আমার স্ত্রীর কথার যৌক্তিকতা রয়েছে। নিজের চিত্তের দঢ়তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমারই। ঘনিষ্ঠতা করার থেকে নিজেকে নিশ্চয় বিরত রাখতে পারব। কিন্তু আলাদা শোষার মত নাটকীয় কাণ্ড করে পারিবারিক সুনাম নষ্ট করতে যাই কেন? এরপর গ্রামের নিন্দুকেরা নানান খারাপ কথা রটাবে। পরের রাত্তির থেকে নিজের ঘরেই শুতে লাগলাম।

রক্তমাংসের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়বেই। দেহধারণ করলে স্বয়ং ঈশ্বরকেও সংস্কারের অধীনতা মানতে হয়। আমার তখন অল্প বয়েস, পাশে তরুণী নবপরিণীতা স্বী। ব্রত খুব বেশিদিন থাকল না।

আমাদের সেকালে নিয়মকানুন অন্যরকম ছিল। আজকাল বউরা সাজগোজ করে স্বামীর সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যায়, কথায় কথায় তর্ক করে, চটুল রসিকতা করে। হালফ্যাশনের বিবিরা বিলেতফেরত স্বামীকে নাম ধরে ডাকছে খবর পাই। আমাদের সময়ে বৌয়েরা স্বামীদের প্রকৃত শ্রদ্ধা করত, বিনা তর্ক তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত। আমার স্ত্রী তার ব্যতিক্রম ছিল না। রোজ সকালে উঠে সে আমাকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করত। একদিন ভোরবেলা সে আমাকে প্রণাম করছে, লক্ষ্য করলাম তার হাতের অনামিকা মাঝের আঙুলের চেয়ে সামান্য বড়।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। সাধারণত মধ্যমার চেয়ে অনামিকা কখনোই বড় হয় না। লক্ষে একজন মানুষের এমন হতে পারে। লক্ষণশাস্ত্রসার গ্রন্থে এ বিষয়ে কি যেন একটা পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই পরিষ্কার মনে করতে পারলাম না।

পাছে আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই, এই ভয়ে আমার পুথিপত্র বাড়ির লোকেরা লুকিয়ে ফেলেছে--চাইলেও দেবে না। কাজেই অনামিকা বেশি লম্বা হলে সেটা কিসের লক্ষণ তা আমি স্থির করতে পারলাম না। জিনিসটা আস্তে আস্তে মনের তলায় ডুব দিল।

এর অনেক বছর পরের কথা। তখন আমি পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়েছি।

চারিরও জন্ম হয়েছে, তার বয়েস বছর চারেক হবে। নৌকো করে এক শিষ্য বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে চারি রয়েছে। আমাকে সে একদণ্ডও চোখের আড়াল করতে চাইতো না। পরের দিনই দুপুরে ফিরে আসিবার কথা, ভাবলাম—মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই, বেড়াতে পেলে খুশিই হবে এখন।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে রওনা দিয়েছিলাম। স্রোতের মুখে তরতর করে নৌকো ছেড়ে বিকেল চারটের ভেতর অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে এলাম।

শিষ্যবাড়ি আর ঘণ্টা দুয়ের পথ। এমন সময় উত্তর-পশ্চিম কোণে কাজলের দাগের মত একট, মেঘ দেখা দিল। আমরা প্রথমে কেউ গ্রাহা করি নি, কিন্তু মাঝি বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ, তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে বলল—ঠাকুরমশায়, ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। নৌকো কি পারে নেব ?

হেসে বললাম-মেঘ এখনো বহ, দুরে। তাছাড়া ও মেঘে ঝড় নাও হতে পারে। এসব অচেনা জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে লাভ কি বাবা? তার চেয়ে একটু, টেনে চল, আর কতটুকুই বা পথ?

কিন্তু সেই মেঘের রেখা দেখতে দেখতে এগিয়ে এসে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল তুমুল ঝড়। শান্ত নদী মুহূর্তে সংহার মূর্তি ধারণ করল। নবীন মাঝি পাকা লোক, তাই তক্ষনি নৌকো ডুবে গেল বটে, কিন্তু আর বেশিক্ষণ যে ভেসে থাকবে এমন ভরসাও করতে পারলাম না।

এখন পারের দিকে নেবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কারণ নদীতে উত্তাল ঢেউ উঠেছে—নৌকো মাঝির নির্দেশ মানছে না।

হঠাৎ একটা ভয়ানক বাতাসের ঝটকা এল, নৌকো একদিকে কাত হয়ে ছলাৎ করে অনেকখানি জল উঠে পড়ল খোলে। দাঁতে দাঁত চেপে উল্টো দিকে সমস্ত শরীরে শক্তি দিয়ে হাল ঠেলে ধরে নবীন মাঝি বলে উঠল-আর বুঝি নৌকো বাঁচে না ঠাকুরমশায়।

আমার মনের অবস্থা ভেবে দেখ। নিজের জন্য ভাবি না—যত ঝড়ই হোক, আমি ঠিক সাঁতার কেটে পারে চলে যাব। কিন্তু এই উত্তাল নদীতে চারিকে একহাতে ধরে সাঁতার কাটা

boidownload24.blogspot.com

সম্ভব নয়। ওকে ফেলেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারব না।

দু'জনকেই হয়ত আজ ডুবে মরতে হবে।

এইসব ভাবছি, চারি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল-বাবা, তুমি ভয় পেয়েছ ?

বললাম—আমার জন্য নয়, তোমার জন্য ভয় পাচ্ছি মা-

--আমার তো ঝড় দেখতে খুব ভাল লাগছে বাবা। কেমন বড় বড় ঢেউ, শিশুকে আর কি বোঝবি? বললাম ঝড় না থামলে বড় বিপদ মা-

আর একটা দমকা এল, আবার কিছুটা জল উঠল খোলে। আমার মুখ পাংশু, হয়ে গিয়েছিল। চারি বলল-ঝড়ের জন্য ভয় পাচ্ছ বাবা? ঝড় এখনি থেমে যাবে।

বোকা মেয়ে। এখনি শুরু হয়েছে, এ ঝড় কি সহজে থামবার ?

কিন্তু ছই-এর বাইরে তাকিয়ে চারি বলল—ওই দেখ বাবা, ঝড় থেমে যাচ্ছে--

অবাক হয়ে দেখলাম আকাশে গভীব কালো মেঘের স্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বাতাস পড়ে এসেছে। বড় বড় ঢেউ আর উঠছে না। আস্তে আস্তে যেভাবে ঝড় কমে তেমন নয়, এক মুহূর্তেই যেন বাতাসের প্রকোপ কমে গেল। নবীন মাঝিও ঘর্মাক্ত শরীরে পরিস্থিতির এই আকস্মিক পরিবর্তনে অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।

যাই হোক, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপদে শিষ্যবাড়ি পৌঁছে গেলাম।

কিন্তু ঘটনাটা আমি ভুলতে পারলাম না।

এর কয়েকদিন বাদে আমার স্ত্রীর জ্বর মত হল, চারির শোবার ব্যবস্থা হল আমার বিছানায়। আমি বসে বসে লণ্ঠনের আলোয় এক আত্মীয়ের কোষ্ঠী তৈরি করছি, পাশে চারি ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত তখন অনেক হবে। হঠাৎ দেখি আলো একটু একটু করে কমে আসছে।

বাড়ির পুরনো কাজের লোক হারাধনের ওপর খুব রাগ হল, সে নিশ্চয় আজ সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠনে তেল ভরে নি। যাক, একদিক দিয়ে ভালই হল। আর রাত না জেগে শুয়ে পড়া বাক। কাগজ-কলম তুলে রেখে বাতিটাকে সরাতে যাব, মনে হল সেটা বেশ ভারি। খালি লণ্ঠন এত ভারি কেন? লণ্ঠনটা তুলে নেড়ে দেখি তাতে তেল ভর্তি। আশ্চর্য ব্যাপার তো ! তেল যদি থাকবে তাহলে আলো নিভে যাচ্ছে কেন?

অবাক হয়ে বসে রইলাম। চোখের সামনে তৈলভর্তি বাতি একটু, একটু করে নিভে গেল।

ঘর অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করে আমার গা ছমছম করে উঠল। তাহলে কি এতদিন পরে আবার ঘরের বাতাসে দেবধুপের স্বর্গীয়, পবিত্র সুবাস!

চারির মাথার কাছে খাট আর দেওয়ালের মধ্যে যে জায়গাটুকু, সেখানটা ধীরে ধীরে হালকা নীল আলোয় ভরে উঠল। আর সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠল মধুসন্দরী দেবীর ভুবনমোহিনী মুক্তি। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে আমি কি যেন বলতে গিয়েছিলাম। দেবী আঙুল তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—বলেছিলাম আর একবার দেখা হবে। আজ এসেছি। কিন্তু এই শেষবার। আজকের পরে আমাকে চাক্ষুষ আর কখনো দেখতে পাবে না।

হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছি, দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। দেবী হেসে আবার বললেন—দুঃখ কোরো না। আগেই তো বলেছি, আমাকে একবার পেলে কেউ চিরতরে আর হারায় না। তুমি বুঝতে পারো নি ? আমি তো তোমার 'কাছেই আছি। দেখ, তাকাও--

দেবী তর্জনী তুলে ঘুমত চারির দিকে নির্দেশ করলেন।

সেদিকে তাকিয়ে আমার গা শিউরে উঠল।

এ ভো চারি নয়, আমার মেয়ে নয়! মধুসুন্দরী দেবী ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে

শুয়ে রয়েছেন। সেই অবয়ব, সেই অনিন্দ্য দেহকান্তি—কেবল আকৃতি শিশুর মত। দেবী বললেন-কন্যারপে তুমি আমাকে পেয়েছ। এ দৈবাংশী মেয়ে। আমার শক্তির কিছু অংশ আমি ওর মধ্যে সঞ্চাবিত করেছি। সবটা দিই নি, কারণ তাহলে কষ্ট পেত—সংসার করতে পারত না। ওকে যত্ন আর আদরে রেখো।

বললাম--আপনি এ কি দায়ে ফেললেন আমাকে। এ মেয়ে আমি কি করে মানুষ করব? কুড়েঘরে কি আগুন রাখা যায়?

তোমার কোনো চিন্তা নেই। সুখে-দুঃখে মেয়ে ঠিক বড় হয়ে উঠবে। ওর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই, সম্বন্ধ আপনা আপনি হয়ে যাবে। তবে সতেরো বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগে তা হবে না।

নতজানু হয়ে দেবীকে প্রণাম করে শেষ প্রশ্ন করলাম-এমন কেন করলেন দেবী ?

মধুসুন্দরী দেবী বিষন্ন হেসে বললেন--তুমি যেমন আমার জন্য সাধনা করেছিলে, তার ফলে আমিও তোমাকে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রকৃত সাধক পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু প্রণয়ীরপে তো আর সম্ভব নয়, তাই কন্যারপে তোমার-আমার দু'জনের সাধ মেটালাম।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অপার্থিব স্নিগ্ধ নীল আলো। মিলিয়ে গেল ধুপের ঘ্রাণ।

ইহজীবনে সেই আমার মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শেষ দেখা।

একটু, থেমে তারানাথ বলল তোমরা বোধহয় এটাকে গল্প হিসেবেই নিলে।

কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ঘটনা সত্যি আমার জীবনে ঘটেছিল। মেয়ের বয়স চোখের সামনে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেবীর নির্দেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই।

তাঁর অংশে যদি সত্যি মেয়ের জন্ম হয়, তাহলে তিনিই ও ব্যবস্থা করবেন।

অবশ্য আজই--

তারানাথের কথার মাঝখানেই ঘরে ঢুকলেন ব্রজভূষণ চক্রবর্তী।

আমরা সবাই কথা থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ব্রজভূষণ ক্লান্তভাবে হেসে বললেন—দুপরের ট্রেন ফেল করে এই বিপত্তি। বিকেলের ট্রেন ধরে এইমাত্র এসে পৌঁছলাম। মেসেও যাই নি, সটান এখানে চলে এসেছি-

তারপর তারানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি কথার মুল্য রাখার খুব চেষ্টা করি। পনেরো দিন পরে আজ দেখা করবার কথা ছিল। দেখুন, কত কষ্ট করে এসেছি।

তারানাথ বলল-বসুন, বসুন। বিশ্রাম করুন। আপনার মা ভাল আছেন তো?

–মা ভালো আছেন। তাঁকে সুস্থ করে তুলে তবে আসছি। কিন্তু আমার একটা খুব জরুরী কথা আপনাকে বলবার আছে—

--কি কথা?

ব্রজভূষণ মুখ নিচু করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর তারানাথের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বললেন—আমার মত বদলেছে। পথিবীর সব ঘটনাই যুক্তির আলোয় বিচার করা যায় না। সত্যিই ব্যাখ্যার অতীত অনেক কিছু জীবনে ঘটে। গতবার যখন আসি, তখন মনের মধ্যে অবিশ্বাস আর আপনার সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে এসেছিলাম। এজন্য আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি-

তারানাথ হেসে বলল—ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন দেখি না। আপনি আপনার সৎ বুদ্ধিমত কাজ করেছিলেন। নিজের বিশ্বাসকে অনুসরণ করা অন্যায় নয়।

সে যাই হোক, এখন আপনার মতের পরিবর্তন কি করে হল সেটা যদি বলেন তাহলে শুনি—

ব্রজভূষণ বললেন—সেদিন মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দেশের ষ্টেশনে গিয়ে যখন নামলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা। গাড়ি অনেক লেট ছিল। গ্রামের দিকে এগারোটা মানে অনেক রাত। গাড়িঘোড়া কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিন বেশ দুর্যোগ ছিল, মনে আছে নিশ্চয় ? বুঝতে পারলাম বাড়ি পর্যন্ত কয়েক মাইল রাস্তা এই দুর্যোগে পায়ে হেটেই পাড়ি দিতে হবে। দুর্গা বলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

boidownload24.blogspot.com

দেশের স্টেশন থেকে বাড়ি যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা পথ মাঠের ওপর দিয়ে, বনজঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে গিয়েছে। রাস্তাতে কাদা-জল ধানক্ষেত আছে, ঘন দুর্যোগে যাবার পক্ষে আদৌ ভাল নয়। নদীর ওপরে নড়বড়ে একটা কাঠের সাঁকো পেরতে হবে। অন্য পথটা ভাল, ডিস্ট্রিক্ট-

বোর্ডের পিচঢালা রাস্তা বরাবর গ্রাম অবধি চলে গিয়েছে। কিন্তু ও-পথে গেলে প্রায় তিন মাইল বেশি ঘুরতে হয়। মানে গ্রামে পৌঁছতে আমার আরো ঘণ্টাদেড়েক বেশি লাগবে। তখন মায়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঠিক করলাম সংক্ষেপের রাস্তাতেই যাযো, একট, কাদা-জল পড়বে বটে কিন্তু সে আর কি করা যাবে ?

কি ভয়ানক পথ ! গাঢ় অন্ধকারে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠে অন্ধকারকে যেন আরো গাঢ় করে তুলছে। দু'দিকে ধানের ক্ষেত, মাঝখানে পেছল আলের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছি। মাথার উপর ঝিরঝির করে বষ্টি ঝরছে তো করছেই। এর মধ্যে আবার হাত ফসকে কাদায় পড়ে টর্চটা গেল নিভে। কত ঝাঁকানি দিলাম, কিছুতেই আর জ্বললো না।

কোনোরকম বাড়ি পৌঁছলাম। মাঝখানে নদীর ওপর কাঠের পুল পার হবার সময় সত্যি একট, ভয় করেছিল। ছোট্ট, সর, নদী, কিন্তু বর্ষায় তার রপ হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। কাঠের পাটাতনের নিচে দ্রুত বেগে ছুটে চলা জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একবার পা ফসকালে আর দেখতে হবে না।

যাই হোক, বাড়ি পৌছে ডাক্তার-বদ্যি করে মাকে একটু সুস্থ করে তুললাম। দিন ছয়-সাত বাদে সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে আছি, এমন সময় পাড়ার মুরব্বি শ্যামলাল চাটুজ্যে দেখা করতে এলেন। কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর তিনি বললেন—তোমার মত মাতৃভক্ত ছেলে দেখলেও আনন্দ হয় বাবা। মায়ের জন্য ওই ঝড়জলের রাতে আসা-বাব্বাঃ! তার আগের তিনদিন থেকেই আমাদের এখানে কি বৃষ্টি! অতখানি ঘরে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তায় আসতে কষ্ট ও খুব হয়েছে নিশ্চয়। তবে, মা বলে কথা।

বললাম-না শ্যামলাল কাকা, আমি ও-পথে আসি নি। মায়ের জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়েছিলাম কিনা, তাই সোজা পথেই চলে এসেছি -

শ্যামলাল চাটুজ্যে অবাক হয়ে বললেন- নদীর পথে?

-হ্যাঁ, কেন ?

নদী পার হলে কিভাবে ?

একটু অবাক হলাম। শ্যামলাল কাকা গ্রামের পুরোনো মানুষ, তিনি কি জানেন না যে, নদীর ওপর সাঁকো আছে? বললাম কেন, নদীর ওপরে তো কাঠের পুল আছে।

শ্যামলাল চাটুজ্যে বললেন—আছে নয়, ছিল। তুমি তো এলে রবিবার রাত্তিরে ? তার দুদিন আগেই শুক্রবার বিকেলের ঝড়ে ওই সাঁকো ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তোমার নিশ্চয় কোনো ভুল হচ্ছে বাবা, তুমি ঘুরপথেই এসেছ। তখন মায়ের অসুখের চিন্তায় তোমার মন ব্যস্ত হয়ে ছিল--সেজন্য মনে করতে পারছ না-

যতই মন ব্যস্ত থাকুক, এ ধরনের ভুল মানুষের হতে পারে না। কিন্তু শ্যামলাল কাকা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে আমি আর কথা বাড়লাম না। এরপর হয়ত উনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন। কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লাম।

দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বেরলাম নদীর ধারে যাবো বলে। প্রায় মাইল আড়াই পথ, তবে আজ কদিন বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে মাঠঘাট শুকিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

সত্যিই নদীর ওপর কাঠের সাঁকোটা নেই। এপারে যেখান থেকে পুল শুরু হয়েছিল, সেখানে কয়েকটা বাঁশের কাঠ পড়ে আছে মাত্র।

আশ্চর্য! আমি কি তবে বাতাসে হেটে নদী পার হয়েছিলাম।

নদীর ধারেই মাঠে কয়েকজন চাষী ক্ষেতে কাজ করছে। তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম-হ্যাঁরে, এ সাঁকো কবে ভেঙেছে বলতে পারিস ?

সে বলল-কেন পারবো না কর্তা? গেল শুক্কুরবার রাত্তিরে ঝড় হল না?

সেই ঝড়েই তো ভাঙল। কি হড়মড় বিকট শব্দ আজ্ঞে।

লোকটি সবিস্তারে পুল ভাঙার গল্প শুনিয়ে গেল। আমার কিন্তু তখন কানে আর কিছুই ঢুকছে না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে।

এই আমার ঘটনা। এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে আমি জানি না, কিন্তু এটকু বুঝতে পেরেছি যে, আপনার কাছে এসে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ব্রজভূষণ থামলেন। তারানাথ নির্বিকার, ব্রজভূষণের কাহিনী শুনে তার বিস্ময়বোধ হয়েছে বলে মনে হল না।

-আপনাকে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়েছিলাম, সেটা আজ নিয়ে আসার কথা ছিল। এনেছেন কি?

—আজ্ঞে, এনেছি।

--এর মধ্যে খোলেন নি তো?

ব্রজভূষণ দুঃখিত কণ্ঠে বললেন—চকুবতী মশাই, আমি কথার মানুষ।

--বেশ। এবার খামটা খুলে দেখুন দিকি ভেতরের কাগজে কি লেখা আছে।

ব্রজভূষণ বুকপকেট থেকে খাম বের করে ছিলেন। ভেতরে তারানাথের হাতে লেখা সেই কাগজের স্লিপ। তাতে কি লেখা তখনো জানি না, কিন্তু সেটা পড়ে ব্রজভূষণের মখভাব যেন কেমন হয়ে গেল। বিহল চোখে সে তাকিয়ে রইল তারানাথের দিকে।

কিশোরী ব্রজভূষণের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে পড়ল, তারপর নিঃশব্দে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম গোটা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে তাতে লেখা -নদীর ওপর সাঁকোটা কিভাবে পার হয়েছিলেন ?

ব্রজভূষণ আবেগর গলায় বললেন--তাহলে—তাহলে আপনিই কি...

তারানাথ বলল না, আমি নই। আমার ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করে-

ছিলাম যাতে আপনার জীবনে বিশ্বাসের শান্তি নেমে আসে। তিনিই যা করবার করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন আপনি মায়ের কাছে পৌঁছতে পারবেন না।

ব্রজভূষণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে বুঝলেন ?

তারানাথ উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

ব্রজভূষণ আবার বললেন—থাক, আমি জবাব চাই না। কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা রয়েছে, তা আপনাকে পুরণ করতে হবে-

তারানাথ বলল বলুন।

—দেশে আমার এক ভাগ্নে রয়েছে। আই. এ. পাস। খুব শান্ত আর সচ্চরিত্র ছেলে—গ্রামের জুনিয়ার হাই স্কুলে পড়ায়। এবার গিয়ে দেখি তার বিয়ের পাত্রী খোজা হচ্ছে। আপনার মেয়েকে সেদিন দেখে গিয়েছিলাম, ভারি পছন্দ হয়েছিল।

বোনের কাছে আপনার মেয়ের কথা বলায় তিনি রাজি হয়েছেন। আমার তো মেয়ে দেখাই আছে, আর কেউ দেখবে না। সামনের মাসেই সতেরোই কি আপনি বিয়ে দিতে পারবেন । আমাদের কোনো দাবি নেই, শাঁখা-সিদুর দিয়ে পাঠাবেন—

ব্রজভূষণের হাত জড়িয়ে ধরল তারানাথ, বলল—আমি কন্যার পিতা, আমার আর কি আপত্তি থাকতে পারে? যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল।

আমাদের দিকে ফিরে তারানাথ বলল দেখলে ? দেবীর কথা কেমন ফলে গেল? তোমাদের বলা হয় নি, আজ চারির জন্মদিন। আজ ওর বয়েস সতেরো বছর পূর্ণ হল। তোমাদের বৌঠান পায়েস রেধেছেন, সবাই, একটু, খেয়ে যেও--

দেবীর প্রসঙ্গ বুঝতে না পেরে ব্রজভূষণ তাকিয়ে আছেন দেখে তারানাথ বলল—আপনাকে একটা গল্প বলব। আজ নয়, আর একদিন।

চারি আমাদের জন্য পায়েস নিয়ে এল বাটি করে। আজকে তার বিশেষ সাজ করার মর্ম এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তারানাথ ব্রজভূষণকে দেখিয়ে বলল-

একে প্রণাম কর মা, ইনি তোমার--মানে গুরুজন আর কি। এদেরও কর—

আমাদের মজা লাগছিল। ঠিক সতেরো বছরের জন্মদিনেই চারির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

চারি ভেতরে যেতে তারানাথ বলল বছর তিনেক আগে এক সাধুব কাছে লক্ষণশাস্ত্রসাব বইখানা পেয়েছিলাম। অঙ্গুলিসংস্থান অধ্যায় খুলে দেখি লেখা আছে—কোনো জাতিকার যদি অনামিকা মধ্যমার চেয়ে লম্বা হয়, তবে তার দেবাংশী এবং তেজস্বী কন্যার জননী হবার সম্ভাবনা। সবই মিলে গেল, কি বল ?

তারপর ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল—সেদিন আপনার চা খাওয়া হয় নি। এখন একটু চা করতে বলি?

(সমাপ্ত)